একক ২(ক) ❑ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ঃ কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার—উত্তর ভারত, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র

গঠন

২(ক).০ উদ্দেশ্য

২(ক).১ প্রস্তাবনা

২(ক).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

২(ক).২.১ ব্রিটিশ আগ্রাসনের পিছনে মূল অভিঘাত কী ছিল?

২(ক).৩ ব্রিটিশ কোম্পানি ও উত্তর ভারত

২(ক).৩.১ অযোধ্যা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

২(ক).৩.২ অযোধ্যার ওপর কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পর্যায় (১৭৬৪-১৮০৫)

২(ক).৩.৩ কোম্পানি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল : পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান

২(ক).৪ মহীশূর ও ব্রিটিশ শক্তি

২(ক).৪.১ হায়দার আলি ও ব্রিটিশ

২(ক).৪.২ টিপু সুলতান ও ব্রিটিশ

২(ক).৫ মারাঠা শক্তির উত্থান

২(ক).৫.১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধোত্তর মারাঠা শিবির (১৭৬১-১৭৭৩)

২(ক).৫.২ মারাঠা গণরাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সলবঈ-এর চুক্তি (১৭৭৩-১৭৯৯)

২(ক).৫.৩ বেসিনের চুক্তি ও পেশবাতন্ত্রের সমাপ্তি (১৮০১-১৮১৮)

২(ক).৬ ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ : প্রতিরোধ ও সহযোগিতা

২(ক).৭ অনুশীলনী

২(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া কাঠামোয় গড়ে-ওঠা দেশীয় রাজ্যগুলি কীভাবে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শিকার হয়।
- ব্রিটিশ আগ্রাসনের মূল প্রেরণাগুলি;
- দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে কোম্পানির শক্তি বিস্তার;
- কোন্ কোন্ শক্তি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল।

২(ক).১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্যতে বিধৃত হয়েছে যে এই এককটিতে মধ্য-আঠারো শতকের মুঘল-পরবর্তী যুগের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, মূলত অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সূত্র ধরে, ক্রমে রাজনৈতিক বৃত্তেও, কোম্পানি সক্রয় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। মূলত, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের একটা বির্তনের চিত্র, বিভিন্ন এলাকায় তার রাজনৈতিক গ্রাসনের বিবরণসহ তুলে ধরা হয়েছে এই এককে।

২(ক).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণে কয়েকটি স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা রাজ্য। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই শক্তিগুলি ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ শক্তির সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তারের রোধের চেষ্টা চালায়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই মুঘল শক্তি অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা স্বাধীন ও শক্তিশালী হতে শুরু করে—যদিও তা সবসময়ই মুঘল সম্রাটের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করেই হত। এই রাজ্যগুলির শাসকরা নিজ নিজ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা এবং কার্যকরী শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উপরোক্ত কোনো রাজ্যই স্ব-সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় করতে সক্ষম হয়নি। এই রাজ্যগুলিতে অন্তর্বাণিজ্য ব্যবস্থার ভাঙন রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল, এমন বহির্বাণিজ্য বিস্তারেরও চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কাঠামোগত আধুনিকীকরণের অভাবে তা ব্যর্থ হয়।

২(ক).২.১ ব্রিটিশ আগ্রাসনের পিছনে মূল অভিঘাত কী ছিল?

আঠারো শতকের শেষার্ধে মুঘল-পরবর্তী দেশীয় রাজ্যগুলির জায়গা ক্রমশ নিতে থাকে ব্রিটিশ আধিপত্য

১৭৫০ ও ১৭৬০-এর দশকের দুটি যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলা-বিজয় দিয়ে এই ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শুরু হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব দখল করা ও অযোধ্যা রাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে, ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে, এই আধিপত্যবাদের বৃত্ত পূর্ণ হয়। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন ও সুসংহত প্রতিরোধ এসেছিল মহীশূর রাজ্য, মারাঠা যুক্তরাজ্য ও শিখশক্তির মতো দেশীয়, আঞ্চলিক শক্তিগুলির তরফে। কিন্তু এই প্রতিরোধের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী—বিশেষত, দেশীয় বণিক ও পুঁজিপতি শ্রেণী ব্রিটিশ বণিকবাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সাহায্য কালক্রমে সেই দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন বনিয়াদকে দুর্বল করে দেয়, যে দেশীয় রাজ্যের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই দেশীয় পুঁজিপতির দলই ছিল প্রধান স্তম্ভভ। বণিকগোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক প্রভুত্বে এই বিবর্তনের সহযোগী কারণ হিসাবে যে অভিঘাতগুলি কাজ করেছিল তা হল—

(ক) বিশ্বের অন্যান্য অংশে 'পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী' আগ্রাসনের মাধ্যমে 'প্রভাবিত অঞ্চল' তৈরির চেষ্টা চলছিল অন্যান্য পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির তরফে। কিন্তু ভারতে ইংরেজ কোম্পানি 'প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকেই অস্ত্র করে উপনিবেশ স্থাপন করে।

(খ) তার পিছনে ছিল মূলত ভারতে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইউরোপের এই দুটি দেশের পারস্পরিক হানাহানি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের সূত্রপাত করে কর্ণাটকের যুদ্ধ নামে (১৭৪৬—৪৮, ১৭৫১—৫৪ ও ১৭৫৬—৬৩ সালে)। এই দ্বন্দ্বে দেশীয় শক্তিগুলি, তাদের পারস্পরিক অন্তর্কলহের ও সংঘাতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কেউ ইংরেজ, কেউ ফরাসিদের পক্ষ নেয়। একদিকে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে, অন্যদিকে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কৌশল শেখে যে কীভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তার উন্নত সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা যায়। একই সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির অঢেল সম্পদ ও অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে সুপরিকল্পিতভাবে শোষণ ও ধ্বংস করার কৌশলটিকেও ব্যবহার করতে শুরু করে (অর্থাৎ, দেশীয় বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত রাজনৈতিক চক্রান্ত ও অস্থিরতার সঞ্চার করে সামরিক হস্তক্ষেপের এক সুচতুর বিন্যাস।)

(গ) কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার বেইলির মতে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপে বিপ্লবের হাওয়া ও নেপোলিয়নের যুদ্ধের পরিবেশ ব্রিটেনে এক নতুন জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যের জোরদার আদর্শের পাশাপাশি উন্নত ব্রিটিশ জাতির সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটিকে বাইরের জগতে বলপূর্বক ছড়িয়ে দেওয়ার একটা তাগিদ বিশেষত লর্ড ওয়েলেসলির মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বেইলি এই প্রেরণাকে *'nationalistic imperialism'* বা *'জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ'* বলে আখ্যাত করে বলেছেন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে জোরদার করতে এই আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ছিল অন্যতম ইন্ধন।

২(ক).৩ ব্রিটিশ কোম্পানি ও উত্তর ভারত

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়; পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন অযোধ্যা রাজ্যের উত্থান; ১৭৬৯ সালে মহাদজী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্তর-ভারত অভিযান, দিল্লি অধিকার ও মুঘল সম্রাটকে মারাঠা সুরক্ষা-

বলয়ে নিয়ে আসা—এ সবই গভর্নর হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রণোদিত করে লর্ড ক্লাইভের আমলের বিদেশনীতিকে পরিবর্তিত করতে।

২(ক).৩.১ অযোধ্যা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

আঠারো শতকের মধ্যভাগ অব্দি অযোধ্যা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। বস্তুতপক্ষে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ অব্দি ভারতে কোম্পানির কার্যকলাপ মূলত উপকূলীয় বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (মাদ্রাজ—১৬৪০-এ কোম্পানির দখলে আসে, বোম্বাই—১৬৬৮-তে ও কলকাতা—১৬৯০-তে স্থাপিত হয়) একটি Joint Stock Company হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাথমিকভাবে তার অংশীদারদের সন্তোষজনক লভ্যাংশ দিতেই বেশি মনোযোগী ছিল।

অন্যদিকে অযোধ্যা রাজ্যও দিল্লির সম্রাটকে প্রায় ক্রীড়নক বানিয়ে প্রধান ক্ষমতাবান সুবা হিসাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৭৬৪ সালে প্রথম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও অযোধ্যা রাজ্য মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়।

২(ক).৩.২ অযোধ্যার উপর কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পর্যায় (১৭৬৪-১৮০৫)

১৭৬৪ সালে অযোধ্যার তৎকালীন নবাব সুজাউদ্দৌলা মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার নবাব মীরকাশিম-এর সহযোগী হিসাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। বক্সারের যুদ্ধে কোম্পানি জয়ী হয়। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে অযোধ্যার মতো বিশাল রাজ্যকে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে নিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন বা প্রয়োজনীয় অর্থ, রসদ, প্রশাসনিক কর্মচারী অথবা সেনাবাহিনী কোনোটাই ছিল না। অতএব, একজন 'অধীনস্থ মিত্রের' মর্যাদা নিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলাকেই পুনরায় অযোধ্যার সিংহাসনে বসানো হয় ও ভবিষ্যতে মারাঠা বা আফগান শত্রুদের আক্রমণে অযোধ্যা রাজ্যকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হতে লাগল। অযোধ্যার বিপুল আর্থিক সম্পদকেও প্রয়োজনমতো কোম্পানির কাজে ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া গেল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী অযোধ্যার কিয়দংশ কোম্পানি আত্মসাৎ করল ও বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অযোধ্যার বাকি অংশ নবাবকে প্রত্যর্পণ করা হল। এছাড়াও, কোম্পানির প্রতি আনুগত্যের সূচক হিসাবে, এই চুক্তির দ্বারা নবাব তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষার ভার এবং অযোধ্যায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোম্পানি অযোধ্যাকে এতটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল যে, ইউরোপীয় কায়দায় ও সজ্জায় নবাব তাঁর সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলে, কোম্পানি ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে আর একটি চুক্তি অযোধ্যার ওপর বলবৎ করে। এর বলে অযোধ্যার সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতম আয়তন ও সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয় ও তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম সংখ্যাকে ইউরোপীয় কৌশলে শিক্ষিত করা যাবে—এই শর্ত চাপানো হয়। পুনরায়, ১৭৭৩ সালে, বেনারসের চুক্তির দ্বারা অযোধ্যার সেনাবাহিনীর আয়তন কমিয়ে তার এক অংশকে কোম্পানির অধীনস্থ সেনাবাহিনীতে (subsidiary force) পরিণত করা হয়, যার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব চাপানো হয় অযোধ্যার ওপরে। ক্রমশ, এইভাবে অযোধ্যার

অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির বিদেশনীতিতে অযোধ্যাই ছিল মূলস্তম্ভ। ১৭৭৩ সালের চুক্তির ফলে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ড নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে দর-কষাকষিতে প্রবৃত্ত হন। হিমালয়ে দক্ষিণপ্রান্ত বরাবর এক বিস্তীর্ণ উর্বর এলাকা জুড়ে ছিল রোহিলা আফগানদের গণরাজ্য। এর ভৌগোলিক অবস্থান যে কোম্পানির কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ওয়ারেন হেস্টিংসের লেখায় বোঝা যায়,—"রানি এলিজাবেথের শাসনের পূর্বে ইংল্যান্ডের কাছে স্কটল্যান্ডের যে গুরুত্ব ছিল, অবিকল সেই ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে অযোধ্যার নিরাপত্তার প্রশ্নে রোহিলাখণ্ডকে দেখা উচিত।" অতএব অযোধ্যা-সুবার সুরক্ষাবলয়কে দৃঢ় করতে রোহিলাখণ্ডকে গ্রাস করা দরকার, এই উপলব্ধিতে নবাব সুজাউদ্দৌলা ও কোম্পানি সহমত ছিল।

রোহিলা যুদ্ধ : (১৭৭৪)—১৭৭২ সালে রোহিলা উপজাতির প্রধান হাফিজ রহমত খান, নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানির প্রতিনিধি স্যর রবার্ট বার্কারের উপস্থিতিতে, এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর শর্তানুসারে, রোহিলা ভূখণ্ড থেকে মারাঠা সৈন্যকে অপসারিত করতে পারলে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা পাবেন।

মারাঠা সৈন্য রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করেও ১৭৭৩ সালে পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু পেশবা প্রথম মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মারাঠারা সেখানে ফিরে যায়। সুজাউদ্দৌলা এইবার রোহিলাদের কাছে চুক্তির শর্তমতো অর্থ দাবি করলে তারা তা দিতে অস্বীকার করে। অতএব ১৭৭৩ সালে বেনারসে সম্পাদিত কোম্পানি ও অযোধ্যার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডের বিরুদ্ধে কোম্পনির সৈন্য সাহায্য দাবি করেন। এর বিনিময়ে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও তিনি কোম্পানিকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৭৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নেল চ্যাম্পিয়নের নেতৃত্বে কোম্পানির সৈন্য রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে ও অযোধ্যা সেনাবাহিনীর সহায়তায় রোহিলানেতা হাফিজ রহমত খানকে মিরানকাট্‌রা-র যুদ্ধে নিহত করেন (এপ্রিল, ১৭৭৪)। রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোহিলা-যুদ্ধের পিছনে অযোধ্যার নবাবের ব্যক্তিগত লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবণতাকেই দায়ী করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে এই আগ্রাসনে সহযোগী থাকলেও খানিকটা দূরত্ব রেখে সুজাউদ্দৌলাকে সমর্থন দেন। সাময়িকভাবে সুজাউদ্দৌলাও যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকেন ও হেস্টিংসের সম্মতি পান। কিন্তু ১৭৭৪ সালে নবাব পুনরায় হেস্টিংসকে চাপ দিলে অবশেষে কোম্পানির সৈন্য রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে। আলফ্রেড লায়াল কোম্পানির অপরিণত বিদেশনীতিতে রোহিলাযুদ্ধ যে দুর্বল কৌশলেরই পরিণাম, তা লিখে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, দ্বিধাদীর্ণ-নীতি বস্তুতপক্ষে দুর্বল সীমান্তের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর [A shifty line policy is far more unsafe than a weaker frontier.]

এই আগ্রাসন যেভাবে বিনা প্ররোচনায় রোহিলাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল ও নবাব যে সুকৌশলে কোম্পানির সৈন্যকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যই ওয়ারেন হেস্টিংসকে কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য সমালোচিত হতে হয়। 'Indeed, some company officers complained that their troops bore the brunt of the fighting while the Awadh party gained all the spoils and subsequent advantages'.

অতএব, ১৭৭৪ সালের পরবর্তীতে অযোধ্যার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক শক্ত হাতে পরিচালিত করতে কোম্পানি একজন রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। ক্রমশ, কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এই রেসিডেন্ট ও প্রকৃপক্ষে অযোধ্যা রাজ্যের যাবতীয় আর্থিক ও বৈদেশিক নীতি পরিচালন ও নিয়ন্তরণের ভার চলে যায় রেসিডেন্টের হাতে। ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েমের পরম্পরায় প্রথম দৃষ্টান্ত হয় অযোধ্যা। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর অযোধ্যা কোনোরকমে মুঘল সুবার পরিচয়টুকু টিকিয়ে রেখে ক্রমশই কোম্পানির দখলে চলে যায়।

নতুন নবাব আসফউদ্দৌলার আমলে, ১৭৭৫ সাল থেকে লক্ষ্ণৌ হয় অযোধ্যা রাজ্যের নুতন রাজধানী। একদিকে উত্তর ভারতে একরটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য হিসাবে অযোধ্যা কোম্পানির কাছে জরুরি কেন্দ্র হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তার সামরিক বাহিনীকে পুরোপুরি রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোম্পানির নিয়মিত সৈন্যদের সরিয়ে একটি স্বতন্ত্র 'Oudh Auxiliary Force' বা একটি ভাড়াটে বাহিনী তৈরি করা হয় যার পুরো ব্যয়ভারই অযোধ্যার তহবিল থেকে কাটা যাবে স্থির করা হয়। এর পরোক্ষ ফল হল, নবাবের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকে অব্যবহৃত রেখে ক্রমশ অকেজো করে দেওয়া।

আসফউদ্দৌলা-র মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা অযোধ্যাকে আরও দুর্বল করে তোলে। প্রথমদিকে ক্ষমতার অন্যতম দাবীদার ওয়াজির আইলকে (১৭৯৭-৯৮) সমর্থন জানালেও তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব কোম্পানিকে অসন্তুষ্ট করে। ফলে দীর্ঘ বাইশ বছর কোম্পানির আশ্রয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাসিত থাকা সাদাত আলি খানকে কোম্পানি সিংহাসনে বসায়।

এই ক্ষমতা লেনদেনের ব্যবসায়ে কোম্পানি আর্থিকভাবে আরও লাভবান হয়। আরও রাজ্যাংশ গ্রাস করা ছাড়াও কোম্পানি তার রেসিডেন্টের মাধ্যমে অযোধ্যার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপেও দখলদারির হাত বসালো—বিশেষত, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ তৈরির কাঁচামাল সোরা (Saltpetre), বিভিন্ন হস্তশিল্প, যেমন বস্ত্র ও অন্যান্য শৌখিন সামগ্রী; খাদ্য ও বিবিধ পণ্যশস্য—যেমন নীল উৎপাদন—যা ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের জন্য দরকার ছিল—এ সবই কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে এল। এছাড়াও নগদ অর্থ, যা অযোধ্যার ভূখণ্ডে অবস্থিত কোম্পানির পোষ্য সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ বাবদ তারা আদায় করত; কিংবা স্বল্পসুদে কোম্পানির ঋণ গ্রহণ; কিংবা নবাবের তরফে কোম্পানির তহবিলে (বাধ্যতামূলক) সরকারি বা বেসরকারিভাবে দেয় দান (donation)—বিভিন্ন প্রকারে অযোধ্যা কোম্পানির তহবিলে অর্থদানে বাধ্য হয়। [১৭৬৪ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ অব্দি কোম্পানি কেবল জরিমানা বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা; ঋণ বাবদ ৫২,০০,০০০ টাকা ও ভর্তুকি বাবদ ৮০,০০০,০০০ থেকে শুরু করে ১০০,০০০,০০০ টাকা আদায় করে।

এতদসত্বেও নবাব সাদাত আলি খান অযোধ্যার প্রশাসনে স্বনির্ভরতা ও স্বাধিকার ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হলে নতুন গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) কোম্পানির আগ্রাসী ভূমিকাকে তীব্রতর করেন। তাঁর রেসিডেন্টের মাধ্যমে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত গোরক্ষপুর ও রোহিলাখণ্ড এবং দেয়াবের কিছু উর্বর এলাকা প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির এলাকাভুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে সংস্কারের দাবী জানান। সাদাত আলি খান কোম্পানির আর্থিক দাবিদাওয়া পূরণ করলেও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে

কোম্পানির ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। অতএব লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০১ সালের এক নতুন চুক্তি দ্বারা অযোধ্যার নবাবের ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলেন। নবাবের প্রবল আপত্তি সত্ত্বে অযোধ্যার সীমার বাইরে যাবতীয় ভূখণ্ড, যার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৩,০০০,০০০ টাকা, কোম্পানির সেনাবাহিনীর চিরস্থায়ী ভাতা হিসাবে অধিকার করে নেওয়া হল। কোম্পানির দখলিকৃত এলাকা চতুর্দিক দিয়ে অযোধ্যাকে ঘিরে রইল। অযোধ্যাকে 'কুশাাসনের' একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে কোম্পানি তার ভূসম্পদ, বাণিজ্য, শ্রমসম্পদ ও অর্থসম্পদ—সবদিকেই শোষণের জাল বিস্তার করে।

পরবর্তী নবাব গাজীউদ্দিন হায়দারের আমলেও (১৮১৪-২৭) ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির নেতৃত্বে অযোধ্যা গ্রাসের চক্রান্ত বহাল থাকে।

২(ক).৩.৩ কোম্পানি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল : পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি ১৮০৩ সালে চরমে পৌঁছায়, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লি দখল করে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যভারতের পিণ্ডারী অশ্বারোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যখন ব্রিটিশরা অভিযান চালাল তখন স্বাভাবিকভাবেই মারাঠা জনজাতি কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ মারাঠা জাতি কোম্পানির বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা চালানো সত্ত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে।

আঠারো-শতকের আর একটি যোদ্ধা জাতি হিসাবে বাকি ছিল পাঞ্জাবের শিখরা। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে রণজিৎ সিংহ যে রাজনৈতিক আধিপত্য গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম ভিত্তি ছিল ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত, শক্তিশালী সেনাবাহিনী। প্রতিবেশী রাজ্য সিন্ধুর মতোই পাঞ্জাবও উত্তর ভারতের মূল ভরকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের কারণে কোম্পানির আগ্রাসী নজরে পড়েনি। সমৃদ্ধ কৃষি ও বাণিজ্যিক অর্থনীতি পাঞ্জাবে একটি শক্তিশালী সরকার গঠনে সাহায্য করে। সিন্ধুপ্রদেশের অর্থনীতিও সিন্ধুনদ-ভিত্তিক বাণিজ্যের যথেষ্ট লাভ তুলেছিল। ১৮৩০-র দশকের শেষদিকে কোম্পানি তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন হলে এই দুটি দেশের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে।

চার্লস নেপিয়ার ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অঞ্চল জয় করার পর সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন "আমি পাপ করেছি"। সিন্ধু দখলের ক্ষেত্রেও, বাংলার মহাজন জগৎ শেঠের মতো বণিক হটচাঁদ সেখানে কোম্পানির দখলের রাস্তা সুগম করেন। কোম্পানি অবশ্যই তার প্রতিদান দেয় জাহাজ শিল্প ও সমুদ্র বাণিজ্যের কারবার থেকে হটচাঁদকে হটিয়ে দিয়ে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ দখল করার অন্তর্বর্তী সময়ে কোম্পানি আফগানিস্তানে একটি বিপর্যয়কারী অভিযান চালায়, যার ফলে ব্রিটিশদের প্রায় ১৬,০০০ সৈন্য কাবুল দখল করতে গিয়ে প্রাণ হারায়।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর (১৮৩৯) পাঞ্জাবের সমাজ ও রাজনৈতিক বৃত্তে দলাদলির সুযোগ নিতে কোম্পানি দেরি করেনি। পূর্ব-পাঞ্জাবের কিছু শিখ সর্দারের সক্রিয় সহযোগিতায়, দুটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পরে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব ব্রিটিশদের দখলে যায়। জম্মুর ডোগরা-শাসকদের প্রতিভূ গুলাব সিং, যিনি লাহোর

দরবারের একজন সভাসদও ছিলেন, পাঞ্জাব দখলে কোম্পানিকে সাহায্য করেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ ১৮৪৬ সালের অমৃতসরের চুক্তিতে, গুলাব সিং ও তার বংশধররা 'চিরকালের জন্য' কাশ্মীর লাভ করেন। গুলাব সিং প্রতিদানে ব্রিটিশ সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্য ঘোষণায় দ্বিধা করেননি।

পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান অভিযান ও অগ্রাসন কোম্পানির প্রচুর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় তার ক্ষতিপূরণে 'অধিক অর্থবলে সমৃদ্ধ' অধীন কিছু রাজ্যকে কোম্পানি লর্ড ডালহৌসির মস্তিষ্কপ্রসূত 'স্বত্ববিলোপ নীতির' দ্বারা গ্রাস করে, যেমন ১৮৪৮-তে মাতারা, ১৮৫৩-তে ঝাঁসি ও ১৮৫৪-য় নাগপুর। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যাকে চূড়ান্তভাবে গ্রাস করা হয়, এবং এরপর ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২(ক).৪ মহীশূর ও ব্রিটিশ শক্তি

২(ক).৪.১ হায়দার আলি ও ব্রিটিশ

হায়দ্রাবাদের পরেই দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সেটি ছিল মহীশূর। এটি গড়ে উঠেছিল হায়দার আলির নায়কত্বে। মহীশূর সৈন্যবাহিনীর নীচুস্তরের সৈন্য হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করে তাঁর সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উদ্যমের দ্বারা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে নান্‌জারাজকে পরাজিত করে হায়দার আলি মহীশূর রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিদ্রোহী পলিগার (জমিদার)-দের শায়েস্তা করে তিনি বিদনুর, সুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল জয় করেন। একটি কলহ-দীর্ণ রাজ্য থেকে অল্পকালের মধ্যেই হায়দার মহীশুরকে ভারতবর্ষের একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মারাঠাপেশবা, নিজাম ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ১৭৬৪-৬৫, ১৭৬৬-৬৭ ও ১৭৬৯-৭২ খ্রিস্টাব্দে পেশবা মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা-মহীশূর যুদ্ধ হায়দারের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়। কিন্তু মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠা দুর্বলতার সূত্রে তিনি বেলারি, গুটি, চিতলদ্রুগ ও কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী মারাঠা এলাকা দখল করেন।

ইংরাজদের অন্যতম মিত্র আর্কটের নবাব মুহম্মদ আলির প্রতিদ্বন্দ্বী মাহ্‌ফুজ আলিকে হায়দার আশ্রয় দেন। এছাড়া আর্কট ও মহীশূরের মধ্যে এলাকা দখল নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল। মাদ্রাজের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হায়দারের প্রত্যক্ষ সংঘাতের সূত্র জোগায় মালাবার উপকূল মহীশূরের দখলে চলে যায়, যেখানে ব্রিটিশদের ফ্যাক্টরি ছিল। অতএব ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি যখন নিজামের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, হায়দার স্বভাবতই কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হলেন। নিজাম কোম্পানির সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে এমন সময়ে মহীশূর আক্রমণ করলেন যখন অন্যদিকে পেশবা মাধবরাও-এর সঙ্গে হায়দার যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত। পেশবা ও নিজামকে কূটনীতির দ্বারা নিজপক্ষে এন হায়দার নিজাম-সহ আর্কটের বিরুদ্ধে আক্রমণ এগোলেন। শুরু হল প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯)।

কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ কর্নেল স্মিথ হায়দার ও নিজামের যৌথবাহিনীকে চান্‌গামা ও ত্রিনোমালির (১৭৬৭) যুদ্ধে পরাস্ত করলে নিজাম মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন (১৭৬৮)। হায়দার যুদ্ধ চালিয়ে যান ও একক কৃতিত্বে আকস্মিক আক্রমণে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে উপনীত হন (১৭৬৯)। মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ

হতচকিত হয়ে হায়দার আলির সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক একটি চুক্তি করেন (১৭৬৯)।

এর পরবর্তীকালে হায়দার তাঁর বিদেশনীতিতে রক্ষণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন। ১৭৬৯-৭২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা যখন পুনরায় তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তখন তিনি কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু ধূর্ত ব্রিটিশরা সাড়া দেয়নি। পরর্তীকালে (১৭৭৫-৮৩) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনাকালে মারাঠারা হায়দারের সাহায্য ভিক্ষা করলে তিনি ইংরেজ শক্তির সমবেত বিরোধিতার প্রয়েনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শক্তিকে কর্ণাটক থেকে মুছে ফেলার ইচ্ছা ছিল হায়দারের। ইংরেজ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফরাসীরা (মাহে থেকে) হায়দারকে তাঁর সৈনবাহিনীকে শিক্ষিত করা ও প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সরবরাহ করে সাহায্য করেছিল। ইউরোপে ফ্রান্স-ইংলন্ডের যুদ্ধ শুরু হলে ১৭৭৯-তে ইংরেজরা এদেশে মাহে দখল করে। মালাবার উপকূলে তাঁর কর্তৃত্ব থাকায় হায়দার ইংরেজদের মাহে দখলে বাধা দেন।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সুবাদে দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ-বিরোধী এক ত্রিশক্তি-আঁতাত গড়ে ওঠে, যার শরিক ছিল মারাঠা-নিজাম ও মহীশূর। এই শক্তি-সমবায়ের সুযোগে হায়দার পুনরায় তাঁর পুরোনো শত্রু আর্কটের মুহম্মদ আলিকে আক্রমণ করলে (১৭৮০) ইংরেজদের সঙ্গেও সংঘাত বাধে। পরপর যুদ্ধে বিখ্যাত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষরা পিছু হটেন (বক্সার-বিজয়ী মান্‌রো, কর্নেল ব্রেথওয়েট প্রমুখ)। এইসময়ে সলবঈ-এর (১৭৮২) সন্ধির মাধ্যমে মারাঠারা যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু হায়দার একাই ব্রিটিশ-বিরোধিতা চালিয়ে যান। হায়দারের সুযোগ্য পুত্র টিপু-ও যুদ্ধে অংশ নেন। ফরাসি নৌবহরের একটি অংশ ১৭৮২-তে মহীশূরের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সিংহলের অংশ ত্রিঙ্কামালি ফরাসি দখলে চলে যায়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই (১৭৮০-৮৪) হায়দার মারা যান (১৭৮২)। টিপু সুলতান মহীশূরের পরবর্তী শাসক হিসাবে ঘোষিত হন। অচিরেই ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থামে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর সমাপ্তি হয়।

২(ক).৪.২ টিপু সুলতান ও ব্রিটিশ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে টিপু সুলতান ছিলেন একজন অবৈধ (usüper) ও গোঁড়া ইসলাম-মনোভাবাপন্ন-অত্যাচারী-শাসক, যিনি প্রায় ষোল বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ স্বার্থস্থাপনে বাধা দিয়ে গেছেন। তাঁদের মতে টিপু শেষমেংশ ফরাসি শক্তির সাহায্য নেওয়ার মতো অবিমৃষ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখানোর জন্য নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনেন।

অপরদিকে মুসলিমদের কাছে টিপু সুলতান ছিলেন একজন শহীদ যিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। পরের দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয় 'জাতীয়তাবাদী' মাত্রা—যা টিপুকে একজন 'আলোকপ্রাপ্ত' ও 'আধুনিক' শাসক হিসাবে চিত্রিত করেছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ঠেকাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কালের সঙ্গে সমতালে চলার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। নতুন ধরনের পঞ্জিকা, নতুন মুদ্রাব্যবস্থা ও ওজনের মান প্রবর্তনের আগ্রহী ছিলেন টিপু। ফরাসি বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ছিল। শ্রীরঙ্গাপত্তমে তিনি 'স্বাধীনতা-বৃক্ষ' রোপণ করেন। 'জ্যাকেবিন ক্লাবের'ও সদস্য হন তিনি। টিপুর সেনাবাহিনী শেষপর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করে তাঁর প্রতি

আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। টিপু জায়গীর প্রথা লোপের চেষ্টা করেন যার ফলে রাজকোষের আয় বেড়েছিল। পলিগারদের পুরুষানুক্রমিক ভাবে সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার বিলোপের চেষ্টাও তিনি করেন। তাঁর ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বেশ চড়া ছিল—মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। অষ্টাদশ শতকের যে কোনো ভারতীয় শাসকদের চেয়ে আগে ও পরিপূর্ণভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তি শুধু দাক্ষিণাত্যে নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই বিপদের কারণ। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির শত্রুরূপে অবিচল দৃঢ়তা সহকারে তিনি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে ইংরেজরা তাঁকে ভারতে তাদের ভয়ঙ্করতম শত্রুরূপে গণ্য করত।

টিপু সুলতানের শাসনকালকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—প্রাক্ ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ ও উত্তর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম পর্যায়ে টিপু সাফল্যের সঙ্গে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান; ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন; কুর্গের বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে দুটি অভিযান পাঠান (১৭৮৫)। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি ও ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের শুরু দিকে মারাঠা-মহীশূর যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন ও মারাঠাদের সঙ্গে গজেন্দ্রগড়ের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও টিপু ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের ইস্তম্বুলে অটোমার সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের কাছে এবং ১৭৮৭ সালে ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় সম্রাট ষোড়শ লুই-এর কাছে দূত প্রেরণ করেন। ১৭৮৮ সালে কুর্গের অধিবাসীরা ফের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং মহীশূরের বিরুদ্ধে এবারের অভ্যুত্থানে তারা অনেকটাই সফল হয়। যাইহোক, ১৭৯০ সাল অব্দি টিপু তাঁর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন খুবই মনোযোগী ছিলেন, বিশেষত, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের উন্নয়নে। কিন্তু ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দেরই মাঝামাঝি থেকে মহীশূরের সমৃদ্ধির চাকা ঘুরে যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিপুর প্রথম সংঘাত হয় দেশীয় ক্ষুদ্র রাজা ত্রিবাংকুরে সঙ্গে। ১৭৬৪ সালে ত্রিবাংকুরের রাজা রামবর্মা তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমানা সুরক্ষিত করার সময় অবৈধভাবে মহীশূরের করদ রাজ্য কোচিনের সীমা লঙ্ঘন করেন। এছাড়া মালাবার উপকূল এলাকায় কিছু দ্বীপভূমি ও সংলগ্ন দুর্গ রামবর্মা ডাচদের কাছ থেকে ক্রয় করেন, যার ওপর টিপুর বহুদিনের নজর ছিল। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সংকট ঘনীভূত হয়। ব্রিটিশদের মিত্রশক্তি হিসাবে ত্রিবাংকুর-রাজ টিপুর বিরোধী কিছু বিদ্রোহী শক্তিকেও আশ্রয় দেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি টিপু ত্রিবাংকুর রাজ্য আক্রমণ করলে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস একেই উপলক্ষ করে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধের সূচনা করেন।

১৭৯০ সালের শেষাশেষি মহীশূর-বিরোধী সমস্ত দক্ষিণী শক্তিগুলির সঙ্গে (মারাঠা, নিজাম, কান্নান্নোর, কুর্গ ও কোচিনের রাজা ও মালাবারের শাসকবর্গ) লর্ড কর্নওয়ালিস মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহীশূরের হিন্দু রাজবংশের সঙ্গেও কর্নওয়ালিসের গোপন সমঝোতা হয়। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে টিপু বহু যুদ্ধে জয়লাভ করলেও মালাবার এলাকায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। ১৭৯২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নওয়ালিস মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করেন, মার্চে ব্যাঙ্গালোরের দুর্গ দখল করে নেন, এবং মে মাস নাগাদ রাজধানী শ্রীরঙ্গাপত্তমের কাছে উপনীত হন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সমগ্র দক্ষিণী শক্তিবর্গ একত্রে মহীশূরের বিভিন্ন দুর্গ দখল করে রাজধানীর ওপর আঘাত হানলে টিপু অবশেষে হার মানেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ শ্রীরঙ্গাপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

শ্রীরঙ্গাপত্তমের সন্ধি (১৭৯২) টিপুর পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক হয়। মহীশূর রাজ্যের অর্ধাংশ তাঁকে

ছেড়ে দিতে হয় যার মধ্যে বরামহল ও দিন্দিগুল জেলা দুটি—কান্নানোর ও কালিকট বন্দর যায় কোম্পানির ভাগে। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ সীমা অব্দি মারাঠা এলাকা বিস্তৃত হয়; নিজাম পান কুমবুম, কুডাপ্পা, গঞ্জিকোটা ও তুঙ্গভদ্রার নিম্ন ভূ-ভাগ থেকে মারাঠা শক্তি ও নিজাম যে ভূমিগত এলাকা লাভ করেন—তাকে পুনরাধিকার বলা যায়, কারণ সেখানে এই দুই শক্তির দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা যা দখল করল, তা সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন এলাকা—যা স্রেফ বাহুবলে বিজিত।

রাজ্যাংশ হারানো ছাড়াও টিপু বিজয়ী মিত্রশক্তিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। এই বাধ্যবাধকতার শর্তগুলি আদায়ে টিপুর ওপর জোর খাটাতে তাঁর দুই নাবালক পুত্রকে পণবন্দি হিসাবে দিতে কর্নওয়ালিস বাধ্য করেন।

এই অপমান টিপুর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে ক্রমে 'জেহাদে' রূপান্তরিত করে। শ্রীরঙ্গাপত্তম চুক্তির দ্রুত রূপায়ণে এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি নির্মূল করতে যুগপৎ মনোযোগী হয়ে ওঠেন টিপু সুলতান। ভারতে অবস্থিত ফরাসি শক্তি, আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহ ও অটোমান সুলতানের কাছে তিনি মিত্রতার বার্তা পাঠান। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি শক্তির কাছে টিপু ভারতে থেকে ব্রিটিশদের উচ্ছেদকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠান, যাতে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে তাদের যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলা যায়। অটোমান সুলতানের কাছে প্রেরিত (১৭৯৯ সালে) একটি বার্তাতেও টিপু বিস্তারিতভাবে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, যেমন—বাংলা, অযোধ্যা, আর্কট আগ্রাসনে ব্রিটিশ শক্তির নীতি ও কৌশলের যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন, তাতে সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসের পটভূমিকার ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করা যায়।

১৭৯৭ সালের শেষাশেষি ফরাসি শক্তির সঙ্গে টিপুর সম্ভাব্য রাজনৈতিক আঁতাত ব্রিটিশ শিবিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তোলে। ওই বছরের অক্টোবর মাসে নিজাম কোম্পানির সঙ্গে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তিতে আবদ্ধ হন ও একটি পুতুল শক্তিতে পরিণত হন। ১৭৯৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ শক্তি মহীশূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। মে মাসেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। শ্রীরঙ্গাপত্তম রক্ষার্থে টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। মহীশূর ব্রিটিশ দখলে আসে।

মহীশূরের রাজনৈতিক পতনের পিছনে কোম্পানির অর্থনৈতিক অভিসন্ধির চেহারাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আগ্রাসনেই (সিন্ধু, পাঞ্জাব, মহীশূর) কোম্পানি দেশীয় পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণী ও সামাজিক মধ্যবর্গীয় শ্রেণীর সহযোগিতা আদায় করে নিয়ে তবেই রাজনৈতিক আগ্রাসনে হাত বাড়িয়েছিল (৩.২.১ অধ্যায়ে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে)। দক্ষিণ-পূর্বে করমণ্ডল উপকূল এলাকা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূলে কোম্পানির একক আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহযোগী ছিল গুজরাটী মহাজন গোষ্ঠী ও হিন্দু রাজস্ব ব্যবসায়ী শ্রেণী (এ চিত্র নিজামের অন্তর্গত এলাকা কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী উত্তর সরকারের ক্ষেত্রেও একই ছিল)। আরও দক্ষিণে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত পুঁজি-লেনদেনের ব্যবসায়ে হিন্দু রাজস্ব ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। আর্কটের নবাবকে এই দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণী ঋণের জালে আবদ্ধ করেছিল। অতএব, কোম্পানি অতি সহজেই আর্কটের মতো একটি দেশীয় রাজ্যকে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তির জালে আবদ্ধ করে, যার শর্তানুসারে বাৎসরিক দেয় একটি নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে নবাব ইংরেজদের কাছ থেকে সুরক্ষা 'ক্রয়' করতে বাধ্য হন।

মারাঠা ও মহীশূরের মতো শক্তিশালী দেশীয় রাজ্যগুলি অপরপক্ষে একদিকে 'উত্তর সরকার' কিংবা 'আর্কট' ত্রাসে উদ্দ্যোগী হলে কোম্পানি কোনরকম 'অধীনতামূলক' চুক্তির আড়ালে না থেকে আঠারো শতকের শেষাশেষি, দাক্ষিণত্যের 'মিত্র' শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসনের আওতায় নিয়ে আসে।

১৭৬০ -এর দশকে মহীশূর, মালাবার কিংবা করমণ্ডল উপকূলে কোম্পানির অনুপ্রবেশকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মালাবার এলাকায় হিন্দু বণিকদের সঙ্গেস্বার্থঘটিত আঁতাত স্থাপন ও ঐ এলাকার বাণিজ্যিক পুঁজির কারবার থেকে মহীশূর রাজ্যকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কোম্পানি আগ্রাসী ভূমিকা নেয়। টিপু সুলতানের আমলে উদ্বৃত্ত রাজস্বের বেশিরভাগটাই আসত পলিগার-শ্রেণীর ভূ-স্বামী ও মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের উপর চাপানো কর থেকে—গরিব রায়তদের শোষণ করে নয়। বাণিজ্যিক পুঁজির ওপর থেকে রাজস্ব আদায়ে যেমন টিপু মনোযোগী ছিলেন, তেমনি বহির্বাণিজ্যে প্রসার ঘটানোর জন্য আরব ও ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপন করেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ইংরেজ যুদ্ধবন্দীর স্মৃতিকথায় মহীশূরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চেহারা ধরা পড়েছে এইভাবে—"...extensive paddy fields and country which was very rich, highly cultivated, full of cocoanut trees, groves, fields abounding with grain, and well-built and populous villages"। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আরও ছবি পাওয়া যায় বুকাননের *JOURNEY FROM MADRAS*-এ।

অতএব, ১৭৯০-এর দশকের সমৃদ্ধ মহীশূর রাজ্য, যা টিপু সুলতান তাঁর পিতা হায়দার আলির কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিলেন, এবং গোটা উপদ্বীপিয় ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে যা অবস্থান করছিল, সামরিক ক্ষমতায়ও যে রাজ্য সমসাময়িক সকল দেশীয় শক্তির মোকাবিলা করতে পারত—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রম-আগ্রাসী অর্থনৈতিক স্বার্থে তা বাধাস্বরূপ ছিল—এ কথা বলাই বাহুল্য।

২(ক).৫ উদ্দেশ্য

ধ্বংসোন্মুখ মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ভারতের স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মারাঠা শক্তিই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। মুঘল সাম্রাজ্যের হীনাবস্থায় ভারতের রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূর্ণ করার মতো শক্তি একমাত্র মারাঠারাই অর্জন করতে পেরেছিল। এই নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারও অভাব এদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের মধ্যে একতার অভাবই সর্বভারতীয় মারাঠা সার্বভৌমত্ব গড়ে তোলার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের পরাজয় মারাঠাদের জন্য আরও শোচনীয় পরিণাম বহন করে এনেছিল—যা রাজনৈতিকভাবে তাদের মর্যাদা খর্ব করে দিয়েছিল। মারাঠাদের এই পরাজয়ে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল ইংরেজরা, কারণ মারাঠাদের দুর্দশার সুযোগে তারা বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল। বস্তুত পাণিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধের মীমাংসাটি হয়েছিল নঞর্থক—অর্থাৎ ভারত-শাসনের অধিকার কার থাকবে না, এই প্রশ্নের।

২(ক).৫.১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধোত্তর মারাঠা শিবির (১৭৬১-৭৩)

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশবর্ষীয় পেশবা মাধবরাও—যিনি রণদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন

করেন—ক্ষমতায় আসেন। তিনি নিজামকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও মহীশূরের হায়দার আলিকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করেন। রোহিলা-আফগান, রাজপুত রাজাদের ও জাঠ-সর্দারদের দমন করে তিনি উত্তর-ভারতে আর একবার মারাঠা জাতির প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা শক্তির সহায়তায় সম্রাট শাহ্ আলম দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মারাঠা-আশ্রিত একজন বৃত্তিভোগী সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষয়রোগে মাধব রাও-এর মৃত্যু মারাঠা জাতির ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাতের আকারে নেমে এসেছি । অতঃপর মারাঠা সাম্রাজ্যে বেশ একটা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। পেশবাতন্ত্রের সদর এলাকা পুণেতে ক্ষমতা দখল নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংঘর্ষ নিয়ে এই অশান্তির সৃষ্টি—একজন দাবিদার বালাজী বাজিরাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও, ও অন্যজন ছিলেন মাধব রাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণ রাও একটি চক্রান্তে নিহত হলে একদিকে রঘুনাথ রাও ও অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশ-এর দল গৃহবিবাদে জড়ায়। সদ্যোজাত সওয়াই মাধব-রাও, যিনি পিতা নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুর সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন, তাঁকে ভবিষ্যৎ পেশবা হিসাবে ঘোষণা করে নানা ফড়নবীশ ও 'বারাভাই' নামে মারাঠা সর্দারদের একটি সমিতি রঘুনাথ রাও-এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পেশবা-র গদি না পেয়ে হতাশ রঘুনাথ রাও ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা চালান।

পেশবা-র ক্ষমতাও এই সময়ে বেশ সংকুচিত হয়ে এসেছিল। নানা ফড়নবীশ-এর নেতৃত্বে সওয়াই মাধব রাও-এর সমর্থকদের সঙ্গে রঘুনাথ রাও-এর পক্ষাবলম্বীদের বিরোধ ও ষড়যন্ত্রে রাজধানী পুণের পরিবেশ অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে উত্তর ভারতে বড় বড় মারাঠা সর্দাররা নিজেদের জন্য অর্ধ-স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মতো প্রবল প্রতাপশালী মারাঠা সেনাপতি, কিংবা নাগপুরের ভোঁসলে, ইন্দোরের হোলকার ও বরোদার গায়কোয়াড় বংশ উল্লেখ্য। সিন্ধিয়া ও নানা—এই দুই প্রতিভাদর ক্ষমতার কেন্দ্র পরস্পরকে সমীহ করে চললেও একমতে কখনোই উপনীত হতে পারেননি। পেশবাতন্ত্রের প্রতি এঁদের আনুগত্য কমলেও পুণের ক্ষমতাচক্রে হস্তক্ষেপ করতে এঁরা প্রতেকেই উৎসাহী ছিলেন।

অন্যদিকে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্টের মাধ্যমে ভারতে অবস্থিত সমস্ত ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সিগুলিকে—অর্থাৎ মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে কলকাতার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল পদে উন্নত করে তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে চার সদস্যের একটি কাউন্সিল গড়ে দেওয়া হয়। এই সময় ১৭৫৬ সালে ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হলেও পরবর্তী এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে ব্রিটেনের নৌ-ক্রিয়া ও আগ্রাসী কার্যকলাপে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সেসময়—অর্থাৎ ফরাসি-বিপ্লব পুর্ববর্তীকালে, সামুদ্রিক আধিপত্যের লড়াইয়েও ফ্রান্স ইংরেজদের কিছুটা হঠিয়ে দেয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ সালে পেশবা মাধবরাও-এর মৃত্যু একদিকে মারাঠা যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এবং অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য—উভয়কেই প্রভাবিত করে।

২(ক).৫.২ মারাঠা গণরাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সলবঈ-এর চুক্তি (১৭৭৩-১৭৯৯)

এই পর্বে উত্তর ভারতে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীশ্বর হয়।

সিন্ধিয়ার হাতে ছিল সেই সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট সামরিক বাহিনী। পুরানো গেরিলা রণনীতি ত্যাগ করে বিখ্যাত ফরাসি সেনাপতি De Boinge-এর তত্ত্বাবধানে তা ক্রমশই ইউরোপীয় মডেলে শিক্ষিত হচ্ছিল। ১৭৮৪ সালে সম্রাট শাহ্ আলমকে তিনি তাঁর সুরক্ষা কবচে বন্দী করে ফেলেন এবং পেশবা পদটি সম্রাটের সহকারী মর্যাদাভুক্ত হবে (নায়েব-ই-মুনাইব)—এই স্বীকৃতি সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেন। এর সঙ্গে শর্ত ছিল এই যে স্বয়ং মহাদ্জী সিন্ধিয়াই পেশবার প্রতিনিধিরূপে কাজ করে যাবেন। সেই সময়ের দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ নানা ফড়নবিশের সঙ্গে এইভাবে রণনীতিজ্ঞ সিন্ধিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন, যার নেতিবাচক প্রভাব সলবঈ-এর চুক্তিতে পড়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৭৭৪ সালে পেশবা নারায়ণ রাও-এর হত্যার পর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খার শেষে রঘুনাথ রাও প্রভূত অমর্যাদার সঙ্গে পেশবাপদ দখল করেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুণায় নারায়ণ রাও -এর শিশুপত্রের পক্ষ নিয়ে গড়ে ওঠে পাল্টা কেন্দ্র—যার নেতৃত্বে ছিলেন বালাজী জনার্দন বা নানা ফড়নবীশ, সখারাম বাপু, মহাদ্জী সিন্ধিয়াকে নিয়ে তৈরি 'বারাভাই'-নামে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ১৭৯৪ সাল অব্দি এই গোষ্ঠী নানা-র নেতৃত্বে মারাঠা রাজনীতিকে পরিচালনা করে। হতাশ রঘুনাথ রাও ১৭৭৫ সালে বোম্বাই-এর কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে ১৭৭৭ সাল নাগাদ মারাঠারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিবেশি মহীশূরের সঙ্গে মারাঠারা সন্ধি স্থাপন করে এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূরের হায়দার আলি ও মধ্যভারতে নাগপুরের ভোঁসলে গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি ব্রিটিশ-বিরোধী চুক্তিতে উপনীত হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত এই চতুঃশক্তি-সমবায় স্থির করে যে একসঙ্গে তারা বাংলা, উত্তর সরকার পরগণা (নিজামের এলাকা) ও কর্ণাটক বিভিন্নমুখী আক্রমণ চালিয়ে কোম্পানির সৈন্যকে ব্যতিব্যাস্ত করবে।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সুচতুর কূটনীতির খেলায় নিজামকে গুন্টুর ফেরত দিয়ে কোম্পানি এই শিবির ভেঙে দেয়। মাধোজী ভোঁসলেকে-ও প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়। ১৭৮০-তে কল্যাণ ও বেসিন দখল করে কোম্পানি নানা-র ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি মারাঠা শক্তিকে সন্ধি করতে বাধ্য করে।

সলবঈ-এর চুক্তি : প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়, কিন্তু হেস্টিংসের কূটনীতির কাছে পরাজিত হয়ে মারাঠারা অচিরেই মহীশূরের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়। কর্ণাটকে মহীশূর-অধিকৃত সমস্ত এলাকা হায়দার আলিকে প্রত্যর্পণে বাধ্য করানোই ছিল মারাঠাদের দায়িত্ব। এ কাজে ভবিষ্যতে পেশবা কোম্পানির সঙ্গে সামরিক আঁতাতেও রাজি বলে মহাদ্জী জানান। এছাড়াও সন্ধির শর্তানুযায়ী, সলসেট কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়, কোম্পানিকে বাণিজ্যগত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, পেশবাকে অন্য কোনো ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধ করা হয় ইত্যাদি।

অতএব যুদ্ধের প্রাক্কালে শান্তির জন্য উদ্গ্রীব ব্রিটিশ পক্ষ, যারা মহাদ্জীর প্রবল সামরিক পরাক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে কর্তৃপক্ষকে জানায়—"We are altogether unequal to the difficult and dangerous contention in which we are now engaged."—(কোম্পানির সেনাপতি স্যর আয়ারকূটের চিঠি থেকে উদ্ধৃত) এই পরিস্থিতি থেকে কোম্পানিকে বাঁচায় মহাদ্জী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশ-এর পারস্পরিক মতানৈক্য। ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়াতে সিন্ধিয়া চাইছিলেন উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তার

ঘটাতে; অন্যদিকে নানা-র নীতি ছিল মহীশূরের পতন ঘটিয়ে দক্ষিণমুখী বিস্তার ঘটাতে। সলবঈ-এর চুক্তি রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া মারাঠা রাজনীতিতেও প্রধান পুরুষ হতে চান। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টগর্ডনের ভাষায়—"the tail was wagging the dog". সলবঈ-এর চুক্তিতে মহাদ্‌জীর ভূমিকা নিয়ে নানা-ও ক্ষুব্ধ হন। নানা-র দক্ষিণমুখী নীতি বাস্তবে অবশ্য কার্যকরী হয়নি, কারণ মহীশূরের নতুন শাসক টিপু সুলতান এই চুক্তিকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে কোম্পানির সঙ্গে একদিকে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন, ১৭৮৪ সালে নিজামকে যুদ্ধে হারিয়ে বহু এলাকা দখল করেন এবং ১৭৮৬—৮৭ সালে মারাঠারা টিপুকে হারালেও আর্থিক বা আঞ্চলিক, কোন দিক দিয়েই লাভবান হয়নি।

১৭৮৮-৮৯ সাল থেকে লর্ড কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজরা পুনরায় চালকের আসনে বসে। ১৭৯০ সালে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মারাঠা শক্তি ও নিজাম—উভয়েই ইংরেজদের সহায়তা করে। ১৭৯২-এর শ্রীরঙ্গাপত্তমের সন্ধি দ্বারা মারাঠা বা নিজাম যা অঞ্চল লাভ করে, তার থেকে অনেক বেশি লাভবান হয় কোম্পানি।

১৭৯২-পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিধান্বিত মারাঠা শিবির পুনরায় টিপুর দিকে ঝোঁকেন। এইসময় লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) নতুন গভর্নর জেনারেল হিসাবে ভারতে আসেন ও কোম্পানির ইতিহাসে আগ্রাসনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী অর্ধদশক মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া উত্তর ভারতের মালব, দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকা, আহির, কিচি, বুন্দেল প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠী ও রাজপুতদের পরাজিত করেন ও তাঁর সামরিক খাতে ব্যয় উপর্যুপরি বেড়েই যায়। অন্যদিকে দুর্বল নিজামের বিরুদ্ধে বিদার, আদোনি ও বেরার প্রদেশের ওপর চৌথ আদায়ের দাবি নিয়ে মারাঠা সৈন্য যুদ্ধে নামে। ১৭৯৫ সালের শেষে সওয়াই মাধব রাও-এর মৃত্যু হলে পুনরায় গৃহবিবাদ তুঙ্গে ওঠে। ইতিমধ্যে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হলে দৌলত রাও সিন্ধিয়া নতুন পেশবা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা-র বিরোধী শিবির গড়ে তোলেন। বহু চক্রান্তের পরে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও-কে নানা পেশবা করতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যু মারাঠা শক্তির পতনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

২(ক).৫.৩ বেসিনের চুক্তি ও পেশবাতন্ত্রের সমাপ্তি (১৮০১-১৮১৮)

লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি দক্ষিণের অবশিষ্ট স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিও ফরাসি শক্তির মধ্যে সম্ভাব্য মিত্রতা রুখতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আগ্রাসন চালায়। মারাঠা আক্রমণ থেকে বাঁচতে হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির সার্বিক বশ্যতা স্বীকার করেন। মারাঠা ও মহীশূর—এই উভয় শক্তিই কোম্পানির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। টিপু মারাঠা প্রতিনিধি হরিপন্থ ফাড়কে-কে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট লেখেন যে মহীশূর রাজ্য নয়, মারাঠাদের প্রকৃত শত্রু হল কোম্পানি। অতএব, ১৭৯৯ সালে টিপুর রাজ্য আক্রমণে কোম্পানি কোনো ভণিতা করেনি।

কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নানা ফড়নবিশ-এর মৃত্যু নির্জীব মারাঠা শক্তিকে ব্রিটিশদের সামনে নতজানু করে। দ্বিতীয় বাজিরাও-এর মতো অযোগ্য পেশবা, উত্তর মালব ও বুরহানপুরে হোলকার ও সিন্ধিয়ার

মধ্যে যুদ্ধ মারাঠা জাতিকে শক্তিহীন করে তোলে। ১৮০২ সালের অক্টোবর মাসে পুণাতে হোলকারের সৈন্যবাহিনী সিন্ধিয়া ও পেশবার যুগ্ম বাহিনীকে পরাস্ত করে ও পুণে হোলকার সেনার দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বাজিরাও ব্রিটিশদের আশ্রয়ে পালিয়ে যান ও ১৮০৩ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে অধীনমূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সুরাট ব্রিটিশদের হস্তগত হয় ও পুণায় কোম্পানির প্রতিনিধিকে পেশবার কাজে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হয়।

একদিকে লর্ড ওয়েলেসলি ও লর্ড লেকের অধীনে বিশাল ও সুশিক্ষিত কোম্পানির সৈন্যবাহিনী পুণের সদর দফতর দখল করে ও গোটা ১৮০৩-০৪ সাল ধরে উত্তর মহারাষ্ট্রে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাস্ত করে। বুরহানপুর, আসির প্রভৃতি এলাকা কোম্পানির দখলে চলে যায়। কোম্পানির সেনাদলের অপর একটি শাখা দিল্লি, আগ্রা ও চম্ভবলের ডত্তরে সিন্ধিয়ার যাবতীয় ভূখণ্ড দখল করে নেয়; এমনকি মুঘল সম্রাটের ওপর প্রতীকী কর্তৃত্বের অধিকারও। পুণে দখলের পর মালবের উত্তরে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠী, জাঠ, রোহিলা ও বুন্দেলা—সব গোষ্ঠীই কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

এই পর্যায়ে ব্রিটিশ শক্তির চূড়ান্ত আগ্রাসী নীতির ফলে কোম্পানি আর্থিকভাবে প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়লে, কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ—যাঁরা ভূখণ্ড আগ্রাসনের চেয়ে আর্থিক লাভের হিসাবে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন, —লর্ড কর্নওয়ালিসকে পুনরায় ভারতে পাঠান। দ্বিতীয়ত, মারাঠা-যুদ্ধের (১৮০৩-০৫) সন্তোষজনক মীমাংসার্থে কর্নওয়ালিসের নতুন ব্যবস্থায় হোলকার ও সিন্ধিয়া—উভয়েই তাঁদের হাত এলাকার অল্প অংশ ফেরৎ পেলেন (মালব সমভূমি অঞ্চল); উপরন্তু রাজপুতানার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি কোম্পানি বাতিল করল। তৃতীয়ত, পেশবার কর্তৃত্বের ন্যূনতম চিহ্নটুকুও মুছে দিয়ে বিভিন্ন মারাঠা গোষ্ঠীগুলিকে কোম্পানির কাছে তাদের দাবিদাওয়া সরাসরি পেশ করতে বলা হল। কেবল পদমর্যাদাটুকু বজায় রেখে পেশবার যাবতীয় ক্ষমতা—এমনকি খাজনা আদায় করাও কোম্পানি হরণ করে নিল।

ক্ষমতাহীন পেশবাতন্ত্রের এই মর্যাদাহীন কাঠামো আরও দশবছর টিকে ছিল। ১৮১৭-র জুন মাসে পেশবা ও কোম্পানির ম্ধ্য একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ঘোষণাপত্রে পেশবাতন্ত্রকে পুরোপুরি 'অকার্যকরী' বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য মারাঠা রাজ্যগুলি অবশেষ স্ব-স্ব বলে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্য হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখল।

মারাঠা শক্তির পতন ও পর্যালোচনা : ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট গর্ডন, তাঁর 'The Marathas : 1600-1800' গ্রন্থে মারাঠা শক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নিয়ে আলোচনায় বলেছেন—(১) মারাঠা জাতিসংঘের মূল শক্তি কেন্দ্রমুখী না হয়ে ক্রমেই বিকেন্দ্রীভূত হয় (Shift in power from the centre to the peripheral Maratha States)। ১৭৩০ সালের পর থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে ও গায়কোয়াড় গোষ্ঠী নিজস্ব শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলছিল, এমনকি নিজস্ব কর সংগ্রহ ও বিচারব্যবস্থা পর্যন্ত। (২) পুণার কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশই উপরিল্লিখিত দুটি বা তিনটি গোষ্ঠীর সাহায্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। ক্ষমতা ক্রমেই তার হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল যে যত নিপুণ দক্ষতার রাজস্ব-সংগ্রাহক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। ফলে পুণেতেও দেখা গেল ক্ষমতার বিভাজন। ক্রমে শিবাজীর বংশধরদের হাত থেকে পেশবা; পেশবা-র বংশধরদের হাত থেকে অধীনস্থ কর্মচারী নানা ফড়নবীশ-র হাতে ক্ষমতা চলে যায়। (৩) এছাড়াও

একা রঘুনাথ রাও-কে তুরূপের তাস করে ব্রিটিশরা মারাঠা যুক্তরাজ্যে কার্যকরী ফাটল ধরাতে পেরেছিল— যে অস্ত্র 'বাংলা' বা 'অযোধ্যাতেও' তারা খাটিয়েছিল, অর্থাৎ ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে চক্রান্তে প্রলোভিত করা।

পুনরায় মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশ-এর অহংবোধ ও পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, ক্ষমতার অলিন্দে 'শিবিরীকরণ' ঘটায়। মুঘল সাম্রাজ্যে ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে রাজানুগত্য দেখা যেত তার চেয়ে বেশি কিছু মারাঠা সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে দেখা যায়নি। মুঘলদের মারাঠারাও করভার বৃদ্ধি করে প্রজাদের শোষণ করত। অতএব সাধারণ প্রজা ও শাসকদের মধ্যে কোনো জনসংযোগ বা আনুগত্য কখনই দেখা যায়নি। "The Maratha State, like the Holy Roman Empire, was a curious and baffling political puzzle. Its whole texture was neither solid, nor rational".

২(ক).৬ ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ : প্রতিরোধ ও সহযোগিতা

আঠারো শতকের শুরুতে ইউরোপে উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার ও প্রাচুর্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতেও বিস্ফোরণ ঘটায় ও তার প্রভাব এসে পড়ে ভারতে ব্রিটিশ বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিবর্তনে। এইসময়ে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক পণ্য ছিল বস্ত্রসম্ভার। ইউরোপ থেকে রূপা আমদানির মধ্য দিয়ে এর মূল্য মেটানো হত। আঠারো শতকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ড থেকে এই ব্যাপক রূপো চালানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের জগতে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাস্তা খোঁজা হয় এইভাবে যে, ভারতীয় রাজস্ব উৎপাদনের মূল উৎসের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায় কিনা (তখনও পুরোপুরি দখল বা নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা হয়নি)।

অবশ্য ইউরোপ থেকে রূপোর নির্গমন ঠেকানোর জন্যই কেবল ভারতে উপনিবেশ বিস্তার হয়— তা নয়। প্রকৃতপক্ষে আঠারো শতকের শেষদিকে ভারতে রাষ্ট্রকাঠামো ও তার অর্থনৈতিক পরিকাঠোমোর অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য ও স্ববিরোধতা কোম্পানির হস্তক্ষেপের রাস্তা তৈরি করে দেয়। এক্ষেত্রে মুঘল যুগের উত্তরাধিকারী স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিতে বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতিবাচক সক্রিয়তা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ।

আঠারো শতকের শেষাশেষি দেখা যায়, কিছু আঞ্চলিক রাজ্য এই দেশীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসাদার শ্রেণীর ওপর তাদের আর্থিক নির্ভরতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করে ও তাদের ওপর করের পরিমাণ বাড়ায়। তুলনামূলক শক্তিশালী রাজ্যগুলির তরফে এই আর্থিক জঙ্গিপনা (military fiscalism) বা বলপ্রয়োগের নীতি সেখানকার বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিমুখ করে ও কোম্পানির প্রতি চক্রান্তমূলক সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করে। ফলে সুযোগমতো বিদেশী মূলধনী শক্তির তরফে দেশীয় বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীকে তথাকথিত 'নব্য-সুলতানী' রাজ্যগুলির বিরোধিতায় উৎসাহিত করা হয়। এটাই ঔপনিবেশিকতার বিবর্তনে আর একটি ধাপ। সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের বিপুল অভিজ্ঞতা তথা আধিপত্য, সুদূর বিদেশ থেকে পুঁজির অনুপ্রবেশ, এদেশে দেশীয় সম্পদের অনাবৃত উৎসের প্রতি লালসা ও সর্বোপরি সামরিক প্রযুক্তির দিক দিয়ে ব্রিটিশদের উন্নত-রণকৌশল—আঠারো শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলির পতনে এদের প্রত্যেকটিরই অবদান ছিল।

শেষে, স্বাধীন এই দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারে ইংরেজরা খুব নিপুণ কৌশলে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিদের হটিয়ে দেয়। বিস্ময়ের কথা, দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভ্যাসে ফরাসিরা ইংরেজ শক্তির চেয়ে দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও, শেষ লড়াইয়ে ব্রিটিশরাই বিজয়ী হয়।

২(ক).৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পিছনে মূল প্রেরণার উপাদানগুলি কী কী?

২। মহীশূর রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির কী চিত্র মেলে?

৩। মারাঠা যুক্তরাজ্য পতনের মূল কারণ কোথায় নিহিত ছিল?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

৪। টিপু সুলতানের চরিত্র ও কার্যাবলী বিচার করে তাঁর শাসনকাল বিশ্লেষণ কর।

৫। অযোধ্যা, মহীশূর—এই দেশীয় রাজ্যগুলির গ্রাসের পিছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের কোনো মূল ধারা খুঁজে পাও কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

৬। রোহিলা যুদ্ধের সময় কে গভর্নর জেনারেল ছিলেন?

৭। কোন্ সন্ধির দ্বারা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শেষ হয়?

৮। বেসিনের সন্ধি কে, কবে স্বাক্ষর করেন?

২(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। বিপান চন্দ্র, ভাষান্তর—গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত : আধুনিক ভারত।

২। A. C. Banerjee : The New History of Modern India, 1707-1947.

৩। Sugata Bose & Ayesha Jalal : Modern South Asia—History, Culture, Political Economy.

৪। Stuart Gordon : The Marathas : 1600—1800.

৫। Kate Bnrittlebank : Tipu Sultan's Search for Legitimacy.

৬। C. A. Bayly : Indian Society and the Making of the British Empire.